মাইকেল



আশুতোষ লাইব্রেরী
ঢাকা ও কলিকাতা

তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা
৩

চতুর্থ

মাইকেল মধুসূদন



শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ.

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স
আশুতোষ লাইব্রেরী
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩২৯

(প্রথম সহস্র)



ঢাকা, আশুতোষ প্রেসে
শ্রীরেবতীমোহন দাসদ্বারা মুদ্রিত

মাইকেল মধুসূদন



(১)

মাইকেলের মৃত্যুতে কবিবর নবীনচন্দ্র বড় আক্ষেপে গাহিয়াছিলেন,—

"বঙ্গের কবিতে! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে;
আজন্ম শৃঙ্খল ভরে দীনা ক্ষীণা কলেবরে
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে।"

বাস্তবিক মাইকেল মধুসূদনের পূর্ব্বে বাঙ্গালার কবিতা মিত্রাক্ষর-রূপ শৃঋলে যেন আবদ্ধ ছিল। মিত্রাক্ষর ছাড়া যে বাঙ্গালায় কবিতা হইতে পারে, ইহা সেই সময়কার বড় বড়

মনীষিদেরও কল্পনায় আসিত না। বাঙ্গালা কবিতার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মাইকেল লিখিয়াছিলেন—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা! পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—"

মাইকেল স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা-বলে বাঙ্গালা কবিতার এই মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী ভাঙ্গিয়া, অমিত্রাক্ষর-রূপ এক সুন্দর নূতন সাজে বঙ্গভাষাকে সাজাইলেন। তাই মাইকেল বাঙ্গালায় অমর—তাই বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট ঋণী।

এই অমর কবি ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ (১৮২৪ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারি) শনিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদের তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে বিখ্যাত দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। পারশ্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল বলিয়া, রাজনারায়ণ সকলের নিকট "মুন্সী রাজনারায়ণ" নামে পরিচিত ছিলেন। রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। স্বকীয় বিদ্যা ও অধ্যবসায় প্রভাবে ইনি ওকালতীতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন

করিতেন সত্য, কিন্তু জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেও তিনি কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বদান্যতাও যথেষ্টই ছিল। পুত্র মধুসূদন পিতার দোষগুণ সমস্তই পাইয়াছিলেন। বাক্-পটুতা, অমিতব্যয়িতা, বিলাসিতা, আত্মসংযমের অভাব, ভবিষ্যৎ-চিন্তাহীনতা পিতাপুত্রে প্রায় সমান ভাবেই বিদ্যমান ছিল।

মধুসূদনের মাতা জাহ্নবী দাসীকেই রাজনারায়ণ প্রথমে বিবাহ করেন। মধুসূদনের আরও তিনজন বিমাতা ছিলেন। মধুর জন্মের পর তাঁহার একটী ভ্রাতা এবং পরে একটী ভগ্নী জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহারা বাল্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। এজন্য মধুসূদনই ছিলেন পিতামাতার অতি আদরের ছেলে—বংশের দুলাল। এই বংশের দুলাল স্নেহময় পিতা-মাতার মনে নিদারুণ ক্লেশ দিয়া, অলৌকিক প্রতিভাবান্ হইয়াও শেষ জীবনে কিরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী বাস্তবিকই সকলকে বেশ্ শিক্ষা দেয় যে, পিতামাতার অবাধ্য এবং উচ্ছৃঙ্খল হইলে জীবনে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না,—সাধারণের ত কথাই নাই, যাঁরা জ্ঞানে গুণে বরেণ্য, তাঁরাও পায় না।

বাল্যকাল হইতেই মধুসূদন কতকটা উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তিনি তাহাই করিতেন। বাপমায়ের "আদুরে ছেলে" বলিয়া কেহই তাঁহার কোন কার্য্যে বাঁধা

প্রদান করিত না; সুতরাং বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং ভাল কি মন্দ যে কোন কাজ তিনি সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিতেন, শত বাঁধা বিঘ্ন সম্মুখে আসিলেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই কাজ করিয়া ফেলিতেন। একদিকে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প থাকায় তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন,—অপরদিকে বাল্যে আত্মসংযম শিক্ষার অভাব হওয়ায় উত্তরকালে তিনি দুঃখে, দৈন্যে ও দুর্দ্দশায় নিপীড়িত হইয়াছিলেন। উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে চলিতেন বলিয়াই উত্তরকালে বঙ্গীয় কাব্য-জগতের কহিনুর, বাঙ্গালা কবিতায় নবযুগের প্রবর্ত্তক মধুসূদনকেও নানা দুঃখে দৈন্যে পড়িতে হইয়াছিল।

তবে ছেলেবেলা হইতেই তিনি বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অত ধনদৌলত—কিন্তু তার জন্য তাঁহার গর্ব্ব কোন দিনই ছিল না। আর একটা গুণ তাঁহাতে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইত, সেটা ছিল তাঁর পরের দুঃখ দূর করিবার প্রবল ইচ্ছা। যখন তিনি নিতান্ত বালক তখনও যদি কেহ তাঁহার নিকট আসিয়া নিজের অভাব জানাইত, তিনি অমনি তাহার দুঃখ দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এই অমায়িকতা ও পরদুঃখ-মোচনের ইচ্ছা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

সাত বৎসর বয়সের সময় মধুসূদন গ্রামের পাঠশালায় প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের শিক্ষালাভ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। নানা প্রকারে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিলেও, তিনি বিদ্যার্জ্জনে কখনও শৈথিল্য করেন নাই, এবং লেখাপড়ার জন্য সেই শিশুকালেও তাঁহাকে কখনও তাড়না করিতে হয় নাই। উত্তরকালে যে তিনি দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিগণিত হইবেন, বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায়ই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

ঈশ্বর যেন মধুসূদনকে কবি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার কাব্যে অসীম অনুরাগ দৃষ্ট হইত। বাল্যকালেই তিনি তাঁহার মায়ের নিকট কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামের মহাভারত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তি এত প্রখর ছিল যে, তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের বহু অংশ মুখে মুখে অনর্গল আবৃত্তি করিয়া ফেলিতেন। এই রামায়ণ ও মহাভারতের মায়া কিন্তু মধুসূদন নানা বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এবং এই মহাকাব্যদ্বয় অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। নিজে খুব

সুকণ্ঠ না হইলেও তিনি সঙ্গীতের বড়ই আদর করিতেন। এই সঙ্গীত-প্রিয়তা, কাব্যানুরক্তি এবং তাঁহার জন্মভূমির প্রাণস্পর্শী সৌন্দর্য্য মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তি বিকাশের বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

বিদ্যানুরাগের ন্যায় মধুসূদনের অত্যন্ত উচ্চাভিলাষও ছিল। অন্যে তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ—"ভাল ছেলে" হইয়া যাইবে, এই কল্পনাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পাঠশালায় থাকিতেই তিনি কিরূপে ছাত্রদের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। এই উচ্চাভিলাষ তাঁহার জীবনের সহিত এতই জড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, উত্তর কালেও তিনি তৎকালের লেখকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়াই কাব্যাদি লিখিতেন। এই উচ্চাভিলাষ ছিল বলিয়াই মধুসূদন কাব্য-জগতে এত উচ্চাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(২)

ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময় মধুসূদন পিতার ইচ্ছাক্রমে কলিকাতা হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন। এই হিন্দু কলেজই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করে এবং বঙ্গদেশের অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই

হিন্দু কলেজেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তখন উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ ছাড়া বঙ্গদেশে অন্য কোনও বিদ্যালয় ছিল না। এই কলেজের শিক্ষার রীতি এবং পদ্ধতি অনেক প্রকারে মধুসূদনের চরিত্র-গঠনে সহায়তা করিয়াছিল।

সে সময়ে সবেমাত্র ইংরেজী ভাব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার রীতিনীতি, পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান এদেশে প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন প্রাচ্য ভাবের সহিত নূতন পাশ্চাত্য ভাবের সংঘর্ষ হওয়াতে শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই বিপ্লবে প্রাচীন যাহা কিছু তাহা ত্যাগ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষিত হইত। এই ভাব-বিপ্লবের সময় মধুসূদন তাঁহার স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ লাভ করিলেন।

হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা ছাত্রদিগের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অঙ্কুর বপন করিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন সর্ব্ব-প্রধান। কি প্রকারে ছাত্রদের মনোবৃত্তিগুলির উন্মেষ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে ডিরোজিওর মত শিক্ষক তৎকালে কেহ ছিলেন না। কিরূপে ছাত্রগণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কোন

সামাজিক বা নৈতিক বন্ধন যাহাতে তাঁহার ছাত্রদের চিন্তা-শক্তির উন্মেষে ব্যাঘাত না ঘটায়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে তৎকালে বঙ্গের বহু ছাত্রই জ্ঞানে গুণে যথেষ্ট যশস্বী হইয়াছিলেন, একথা সত্য ; কিন্তু ডিরোজিও ছাত্রদের বিচার-শক্তির উন্মেষ করিতে যাইয়া হিন্দু-সমাজের যে কতকটা সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমানে বিচারদ্বারা যাহার মীমাংসা হইল তাহাই সত্য, ইহা ছাড়া প্রাচীন যে সমস্ত রীতিনীতি বা আচার ব্যবহার আমাদের বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মিথ্যা—মানুষের বিচার-বুদ্ধি যাহা বলে তাহাই করণীয়, অন্য সকলই পরিত্যাজ্য—ইহাই ছিল ডিরোজিওর মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রভাবে অনেক বঙ্গ-সন্তান হিন্দুয়ানা ত্যাগ ও জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছিলেন। এই প্রকার বিষময় শিক্ষার ফলে বালক মধুসূদনেরও পতন ঘটে। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাবে স্বাধীন মতাবলম্বী হইতে যাইয়া মধুসূদন আত্মসংযমের অভাবে ঘোরতর স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। অবশ্যই ডিরোজিও তখন শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন না—ডিরোজিওর কলেজ ত্যাগের পর মধুসূদন হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব তখনও পূর্ণমাত্রায়

বর্ত্তমান ছিল। কলেজের বহু ছাত্র তখনও তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। অবশ্যই সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক নিয়মেরও মাঝে মাঝে সংস্কার না করিলে চলে না, একথাও খাঁটি সত্য; কিন্তু পাশ্চাত্যদের অনুকরণে হিন্দু-সমাজের সংস্কার করিতে যাওয়া যে বিষম ভ্রম, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য রীতিনীতি যে আমাদের দেশের পক্ষে নানা কারণেই অনুপযোগী একথা আজকাল শিক্ষিত মাত্রেই স্বীকার করেন। পাশ্চাত্যের সর্ব্বপ্রকারে অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা যে আমাদের জাতীয়তাটুকু বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি, একথা কে অস্বীকার করিবে?

যাহা হৌক, মধুসূদন হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, এমন কি, সাহিত্যাদিতেও বিশেষ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন—আর বিদেশীয় হাবভাব ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সুরাপান এবং হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে পরম উৎসাহী হইয়া পড়িলেন। ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল, এবং কার্য্যতঃও তিনি ইংরেজীতেই রচনা

আরম্ভ করিলেন। অবশ্য পরিণত বয়সে তাঁহার এ সকল ভ্রম অনেকাংশে দূরীভূত এবং তাঁহার প্রকৃতিও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রথম বয়সে ধীরভাবে বিচার না করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়াতে শেষ জীবনে তাঁহাকে যথেষ্ট অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল। প্রথম বয়সের সংস্কারগুলি তাঁহার সমস্তই যে দূর হইয়াছিল, একথা স্বীকার করা যায় না। শেষ বয়সেও তিনি অনেক পাশ্চাত্য কবিকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে দ্বিধা করিতেন না—রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা ইলিয়াডকে তিনি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরাবরই বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু কলেজের সেই একদেশদর্শী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদির আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতেন, তবে বোধ হয় এই মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি বিদেশীয় কবির এত আদর করিতেন না।

মধুসূদন কলেজে প্রবেশ করিয়াই একজন উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। সাহিত্যে মধুসূদনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, কিন্তু তিনি বরাবরই অঙ্কশাস্ত্রে অবহেলা করিতেন। অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভা গণিতের দিকে আকর্ষণ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য

হইতে পারেন নাই। মধুসূদন যে অঙ্কশাস্ত্র না জানিতেন এমন নহে, কিন্তু তিনি গণিতের প্রতি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। ক্লাশে গণিতের ঘণ্টায় তিনি হয়ত কবিতা রচনা করিতেন, অথবা কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকিতেন। এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে, যাঁহারা সাহিত্যের পরম ভক্ত, গণিতের নামে তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসে—মধুসূদনও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় মধুসূদন অনেক ইংরেজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ইংরেজী রচনায় তিনি সাতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি এমন সুন্দর সুন্দর ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিয়া ফেলিতেন যে, তাহা দেখিয়া অধ্যাপক ও সহপাঠিগণ বিস্মিত হইয়া যাইত। ফলতঃ সে সময়ে হিন্দু কলেজে তাঁহার সমকক্ষ ছাত্র বড় কেহ ছিল না।

পরের দুঃখে ব্যথা এবং তাহা মোচনের জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে মধুর চরিত্রে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। পিতার অর্থের অভাব ছিল না, কাজেই হিন্দু কলেজে পাঠের সময় মধু যথেষ্ট পরিমাণেই টাকা পয়সা পাইতেন। অনেক সময় তিনি পিতৃদত্ত অর্থ গরীব সহপাঠীর অভাব মোচনে বা নিরন্ন ভিক্ষুকের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিতেন।

মধুসূদনের চরিত্রে আর একটা বিশেষত্ব ছিল—তাঁহার অগাধ ভালবাসা। এমন প্রায়ই দেখা যায় যে বাল্যাবস্থায় বা স্কুল কলেজে পাঠের সময়ের বন্ধুতা বয়োবৃদ্ধি সহকারে লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু ওরূপ অসার বন্ধুতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি যাঁহার সহিত মিশিতেন, প্রাণ খুলিয়াই মিশিতেন। বাল্যাবস্থায় যাঁহাদের সঙ্গে মধুর গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় গৌরদাস বসাক ও প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কর্ম্মবশে এই তিন জন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও ইঁহাদের প্রতি মধুসূদনের অনুরাগ কখনও লোপ পায় নাই।

পঠদ্দশায় তাঁহার চরিত্রে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও মিতাচারের অভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রাপ্তবয়সে মধুসূদন দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবনেই তিনি বিলক্ষণ অমিতব্যয়ী, অমিতাচারী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল দোষের জন্য জীবনে তিনি যৎপরোনাস্তি অর্থ-ক্লেশ ও মনঃক্ষোভ ভোগ করিয়াছেন; এমন কি, শেষ সময়ে দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত মধুসূদনকে নেহাৎ ভিক্ষুকের মত আলিপুর দাতব্য হাস-পাতালে কাল কাটাইতে হইয়াছিল। ছাত্রজীবনে নিত্য নূতন

সাজপোষাক আর গন্ধ দ্রব্য না হইলে যাঁহার তৃপ্তি হইত না, কোমল পরিষ্কার শয্যা ছাড়া যিনি কখনও নিদ্রা যাইতেন না, সেই অমিত-বিলাসী কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদন অদৃষ্টবশে শেষ জীবনে অর্থাভাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের কাব্য পড়িবার দিকে একটা ঝোঁক ছিল। হিন্দু কলেজে আসার পর তাঁহার কাব্যে, বিশেষতঃ ইংরেজী কাব্যে অনুরাগ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি পায়। কলেজের নিম্নশ্রেণীতে থাকার সময়েই তিনি ইংরেজীতে পদ্য ও গদ্য লিখিবার অভ্যাস করিতেন। উচ্চ শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি অতি সহজে এবং অতি অল্প চিন্তায় সুন্দর সুন্দর ইংরেজী কবিতা লিখিয়া ফেলিতেন। এই সময়ে তাঁহাদের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন রিচার্ডসন নামক জনৈক সাহেব। তিনি নিজে খুব কাব্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে মধুসূদনের এই ইংরেজী কবিতা লিখিবার প্রবৃত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ত ছিলই না, বরঞ্চ তিনি মাতৃভাষাটাকে একটু কৃপার চক্ষেই দেখিতেন। উত্তরকালে বিজতীয় ভাষায় কাব্য লেখার

প্রবৃত্তি তাঁহার সম্যক দূর হইয়াছিল ; তাই তিনি নিজ মাতৃভাষাকে নূতন সাজে নূতন ভাবে সাজাইতে পারিয়াছিলেন ; তাহা হইলেও, মধুসূদন কবিত্ব-শক্তি বিকাশের জন্য তাঁহার অধ্যাপক রিচার্ডসনের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ না পাইলে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে এক নূতন ভাবের এবং নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন কি না কে জানে ?

মধুসূদন ছয় বৎসর কাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

(৩)

মধুসূদন হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতেই সাহেবী রীতিনীতির একজন বড় ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পোষাক পরিচ্ছদে, আদব কায়দায়, আচার পদ্ধতিতে বিলাতী নীতির অনুকরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সর্ব্বরকমে সাহেবী চালে থাকিলেও যে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন,—ইহা তাঁহার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব—কেহই কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু মধুসূদন সকলের কল্পনাতীত কার্য্যই করিয়া বসিলেন।

মধু যখন হিন্দু কলেজে পড়েন, তখন তাঁহার পিতামাতা তাঁহাদের স্বঘরের কোন এক জমীদার-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। এই সময়ে মধু একদিন তাঁহার মাতাকে বলিয়া বসিলেন,—এ বিবাহে আমার একটুকুও মত নাই; এমন ঘেনৃঘেনে বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া জীবনটা বৃথা করিতে চাহি না। বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে অথবা গুণে কোনপ্রকারেই ইংরেজের মেয়ের সমকক্ষ হইতে পারে না। আমি এ বিবাহ কিছুতেই করিব না। পুত্রের উক্তি শুনিয়া পিতামাতা স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিলেন উল্টা। বিবাহ করিলেই ছেলের মন বদ্‌লিয়া যাইবে মনে করিয়া, তাঁহারা অতি সত্বর শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। বিবাহের দিনও স্থির হইল। কিন্তু তাঁহাদের সকল আশা—সকল ভরসা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বসিলেন। বাপমার সকল আশা ব্যর্থ হইল—মধুসূদন স্বেচ্ছায় পিতামাতার মনে নিদারুণ কষ্ট দিয়া সমাজচ্যুত—জাতিচ্যুত—বিধর্ম্মী হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নামের সঙ্গে "মাইকেল" উপাধি সংযোজিত হইল।

কি কারণে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সমাজ-

চ্যুত—জাতিচ্যুত হইলেন, তাঁহার যথাযথ কারণ বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। ইংরেজদের আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আসক্তি থাকিলেও, শুধু সেইটাই যে তাঁহার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের যথেষ্ট কারণ, ইহা বলা যায় না। হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতেই তাঁহার বিলাত গমনের আকাঙ্ক্ষা অতি বলবতী হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্থিরই ছিল। সেকালে ইংলণ্ড গমন সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ ছিল। মধু বোধ হয় মনে করিয়াছিল, ইংলণ্ড গেলে ত সমাজচ্যুত হইতেই হইবে,—তবে এখনই সমাজচ্যুত হইয়া যাই না কেন,—তবে ত আর পিতামাতা ঐ মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিতে পারিবেন না? তার উপর সম্ভব কোন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল যে, খৃষ্টান হইলে তাঁহার বিলাত গমনে সুবিধা হইবে—বিলাতে যাইয়া যথেষ্ট সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। তরলমতি মধুসূদন বাঙ্গালী মেয়েকে বিবাহ করার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, আর পূর্ণমাত্রায় সাহেব হইয়া সাহেবদের সমাজে মিশিবার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল,—'দেখ দেখি কেমন চুল কাটিয়াছি, ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।' মধু সেদিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল, সম্মুখের চুলগুলা বড়, ঘাড়ের চুলগুলা ছোট। আমি বলিলাম, 'এ কি করিয়াছ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি এক জন 'জিনিয়স' (বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি); 'জিনিয়স' যারা তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে; তুমি যদি পাঁচ চূড়া, কি সাত চূড়া কাটিয়া আসিতে, তা হ'লে যা হোক একটা নূতন রকম কিছু হ'ত। তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মত চুল কেটে এসেছ! এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।' আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না। একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই। মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম।

"তার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান হইতে গিয়াছে। শুনিয়া বড় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে, মধুর সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মধু খৃষ্টান হইবে, খৃষ্টান হইবার

দিকে তাহার মন গিয়াছে, এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও সে আমায় কোন দিন বলে নাই। তাহার ভাব গতিক দেখিয়াও আমি ইহার অণুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইল, কথা সত্য নহে ; আবার মনে হইল, যদি সত্য হয় তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভালবাসা কই জন্মিয়াছিল ? তাহা হইলে ত মধু আমাকে এ বিষয় একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েক জনে মিলিয়া কলেজের ছুটীর পর মধুকে দেখিতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তাহাকে ফোর্ট উইলিয়মে রাখিয়াছে। সেখানে আমি ও আমাদের সমপাঠী গৌর একত্রে গেলাম, কিন্তু দেখা হইল না। পরে মধু যেদিন খৃষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিশপ্‌স্ কলেজে গমন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। বন্ধুভাবে মধুও আমার সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে মুখের ভাব, সে চক্ষের জ্যোতিঃ কোথায় ? মধুর পূর্ব্ব আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।"*

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর মধুসূদনের জীবনের গতি পরি-

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীর পরিশিষ্টে ৺ভূদেব বাবুর লিখিত পত্র হইতে।

বৰ্জ্জিত হইয়া গেল। তিনি খৃষ্টান হওয়াতে হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত হইলেন বটে, কিন্তু পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহার আত্মীয়গণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পরেও, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজি হন নাই।

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর মধু বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার পিতামাতাও পূর্ব্বের ন্যায় বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন। মধুসূদন যাহাতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন, এবং যশস্বী হইয়া নির্ব্বিবাদে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার পিতা-মাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।

মধুসূদন বিশপ্‌স্‌ কলেজে চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সর্ব্বদা ইংরেজ বালকদিগের সঙ্গে চলাফেরা করাতে তাঁহার সমস্ত চালচলনই সাহেবী ধরণের হইয়া পড়িয়াছিল; এবং স্বদেশীয় সমস্ত রীতি-নীতি অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, এইরূপ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ও সামাজিক নানা পরিবর্ত্তনে তাঁহার এই ভ্রমাত্মক ধারণা বহুল পরিমাণে দূর হইয়া গিয়াছিল।

বিশপ্স্ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অনেক ভাষায় অধিকার লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, হিব্রু, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। বহু ভাষায় তিনি অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন; এমন কি, কোন কোন ভাষায় তিনি কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল।

বিশপ্স্ কলেজে ভাষা শিক্ষা ও কবিতা রচনা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও, তাঁহার চরিত্রগত দোষ—উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতা তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। হিন্দু কলেজে থাকিতে বরঞ্চ তিনি কতকটা শাসনের গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন, কিন্তু বিশপ্স্ কলেজে আসিয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে আবার তিনি পিতার সঙ্গে নানা ব্যাপার নিয়া বিষম কলহ বাঁধাইয়া বসিলেন, এবং ইহার ফলে তিনি পিতৃস্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইলেন। এতদিন পিতৃ-দত্ত অর্থেই তিনি নিজের বাবুগিরি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন; অতঃপর পিতৃ-সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। যে দরিদ্রতার সঙ্গে মধুসূদনকে সারা জীবনই প্রায় যুঝিতে হইয়াছিল, সেই দরিদ্রতা ভীষণ মূর্ত্তিতে মধুসূদনের নিকট

প্রকট হইল। যে সকল পাদরী তাঁহাকে সুখের লোভে প্রলোভিত করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিল, তিনি এসময়ে তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাইলেন না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া তিনি অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কলেজে একজন মান্দ্রাজীর সঙ্গে মধুসূদনের খুব বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সেই বন্ধু তাঁহাকে পরামর্শ দিল, মান্দ্রাজ গেলে বোধ হয় তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতে পারিবেন। মধুসূদন আপত্তি করিলেন না। গোপনে পরামর্শ হইল; তারপর হঠাৎ একদিন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে ত্যাগ করিয়া মধু মান্দ্রাজে রওয়ানা হইলেন। এই সময় হইতে পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতার শাস্তি স্বরূপ মধুসূদনকে নানারূপ অশান্তি ও বিপদে ঘিরিয়া ধরিল। অতঃপর মধুসূদন অনেক সময়ই নিজ জীবনটাকে একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বহ অভিশাপ স্বরূপ মনে করিতে বাধ্য হইতেন।

(৪)

মধুসূদন মান্দ্রাজে পৌঁছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তখন একেবারে রিক্ত হস্ত। স্বীয় পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, মান্দ্রাজ পৌঁছিতেই

তাহার অধিকাংশ ব্যয় হইয়া গেল, সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল অল্পদিনের মধ্যেই তাহাও নিঃশেষে ফুরাইল। একে তো নিঃসম্বল অবস্থা, তদুপরি মান্দ্রাজ পৌঁছিবার পরই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপ অসম্ভাবিত বিপৎপাতে এবং নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহাকে অতি দুর্দ্দশায় কাল কাটাইতে হইল। ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে তিনি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এই দুরবস্থাই তাঁহাকে ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। তিনি প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভাবলে তিনি সাহিত্য-সেবা দ্বারা আত্মপোষণোপযোগী অর্থের সংস্থান করিয়া লইলেন। স্থানীয় প্রধান প্রধান পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহার উপরেই তাঁহার জীবিকা নির্ভর করিত। সে সময়ে এদেশীয়দের মধ্যে অতি অল্প লোকই ইংরেজীতে তাঁহার ন্যায় সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিত। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ইংরেজীতে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন।

এই সময়ে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের

চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইংরেজীতে 'ক্যাপটিভ্ লেডি' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। ভারতের তৎকালীন অরাজক অবস্থা, পৃথ্বীরাজের বীরত্ব, সংযুক্তার আত্মত্যাগ, মুসলমানগণের দিল্লী অধিকার প্রভৃতি বিবরণই সংক্ষিপ্ত ভাবে ক্যাপটিভ্ লেডির বর্ণনীয় বিষয়। এই কাব্যখানি পড়িলে বুঝা যায়, ইংরেজী ভাষার উপর মধুসূদনের কতখানি দখল ছিল। বাঙ্গালী কবির এই ইংরেজী কাব্যখানি মান্দ্রাজে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন আর একখানি ইংরেজী খণ্ডকাব্যও রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অতঃপর বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন-কারী ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব মধুকে বুঝাইলেন যে, ইংরেজী ভাষায় কোন বিজাতীয় লোকের কাব্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশা নিতান্তই দুরাশা। অবশ্যই 'ক্যাপটিভ্ লেডি' লিখিয়া তিনি ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ মহলে সাময়িক প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু কোন ইংরেজ কোন দিনই তাঁহাকে ইংরেজী সাহিত্যে কবির আসন দিবে না। বস্তুতঃ মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী কাব্য লিখিয়া তাঁহার বিশেষ লাভ নাই; বরং তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি মনেপ্রাণে মাতৃভাষার সেবা করিলে নিজ ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জনে সমর্থ হইতে পারিবে। বেথুন সাহেবের এই উপ-

দেশের পর হইতেই তিনি স্বকীয় মাতৃভাষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এইখানেই মধুসূদনের ভবিষ্য-জীবনের সূত্রপাত হইল। মধুসূদন তাঁহার ভ্রম সম্যক বুঝিতে পারিয়াই পরে গাহিলেন,—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

* * * * * *

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা, পরে,—
"ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে মধুসূদন রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্‌ নাম্নী স্কচ্‌জাতীয়া এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এই বিবাহের পর তাঁহার অশান্তি দ্বিগুণ বাড়িল। রেবেকার সহিত তাঁহার একটুকুও বনিত না—উভয়ের মধ্যে

কলহ প্রায় লাগিয়াই ছিল। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই রেবেকার সহিত তিনি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মান্দ্রাজ কলেজের অধ্যক্ষের কন্যা হেন্‌রিয়েটার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মধুসূদনের বয়স তখন পঞ্চবিংশ বর্ষ। এই বিবাহের পরে তিনি মান্দ্রাজে "এথেনিয়ম" নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক এবং কিছু দিন পরেই উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি বহুদিন উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল কাজে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত সত্য, কিন্তু তাঁহার অমিতব্যয়িতা, পান-দোষ ও বিলাসিতার দোষে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহার প্রায় সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ অমিতব্যয়িতার ফলে মধুসূদনের দারিদ্র্য-ক্লেশ ও পারিবারিক অশান্তি আর কিছুতেই কমিল না। যে শান্তি ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় মধুসূদন মান্দ্রাজে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা ব্যর্থ হইল। আট বৎসর কাল মান্দ্রাজে থাকিয়া অশেষ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়া তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

এই আট বৎসর কাল প্রবাসে থাকার ফলে মধুসূদনের

আকৃতির ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনি স্বদেশে আসিয়াও যেন বিদেশীর ন্যায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতা এই সময়ে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মচ্যুত জাতিচ্যুত বলিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণও তাঁহার সহিত আর তেমন মিশিতেন না। আলোচনার অভাবে তিনি এ সময়ে মাতৃভাষায় কথাবার্ত্তাও তেমন ভাল বলিতে পারিতেন না; সর্ব্বোপরি ইংরেজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি এ সময়ে পূরাদস্তুর সাহেবি চালে কাল কাটাইতেন। কাজেই তাঁহার নিকট স্বদেশ যে বিদেশের মত প্রতীয়মান হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই।

এই সময়ে বঙ্গদেশে ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধেও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সকল ব্যাপারেই নূতনের সহিত পুরাতনের একটা বিষম সংঘর্ষ চলিতেছিল। তখন সমাজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল। সমাজে বিধবা-বিবাহ নিয়া মহা আন্দোলন চলিতেছিল। ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে এতাবৎ এদেশীয় অনেক ব্যক্তির যে একটা ঘোরতর অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা অনেকাংশে এ সময়ে তিরোহিত হইয়াছিল। অনেক স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়া ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। যে মাতৃভাষাকে তিনি এতদিন মূর্খ

ও বর্ব্বরের ভাষা বলিয়া মনে করিতেন, সেই বঙ্গভাষা এ সময়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তখন বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল; কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন বাঙ্গালা কবিতায় এক নূতন ধারার সৃষ্টি করিতেছিলেন। বঙ্গে যখন সকল ব্যাপারেই এই প্রকার বিপ্লবের অবস্থা, তখন মধুসূদন স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভাষার সেবাব্রত গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। পাশ্চাত্য কবিগণের আদর্শে বাঙ্গালা কবিতা কিরূপ উন্নত ও মার্জ্জিত হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করাই বোধ হয় মধুসূদনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, এবং তাঁহার প্রাথমিক রচনায় বিদেশীয় কবিগণের যথেষ্ট প্রভাব দৃষ্ট হয়; অবশ্যই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

(৫)

সমাজে এইরূপ ভাব-বিপ্লবের সময় মধুসূদন মনে মনে বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অনটন কিছুতেই দূর হইল না। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা জ্ঞাতিদের কেহ কেহ গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল,—কাজেই সেদিকেও তাঁহার বিশেষ কিছুই সুবিধা হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া

তখন কলিকাতা পুলিশ কোর্টে একটী কেরাণীর পদ গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ পদ হইতে অনুবাদকের (ইন্‌টারপ্রেটার) পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে তিনি অনেক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও সমালোচনাদি লিখিতেন এবং তাহাতেও তাঁহার কিছু কিছু অর্থাগম হইত। এত সব করিয়াও কিন্তু তাঁহার অর্থাভাব ঘুচিল না। কিন্তু শীঘ্রই বিধাতা তাঁহাকে এক নূতন পথে চালিত করিলেন—এই পথই তাঁহার ভবিষ্য-জীবনের অতুল কীর্ত্তির পথ। এই পথে চলিয়া অল্প সময়ের জন্য তাঁহার অর্থাভাব ঘুচিলেও,দরিদ্রতা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই—অমন অমিতব্যয়ীর দরিদ্রতা কোন দিন ঘুচিতেও পারে না; কিন্তু এই পথ তাঁহাকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থদান না করিলেও বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মধুসূদন অনন্যসাধারণ প্রতিভামণ্ডিত এবং বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে বিধাতার বিধানে যে নূতন পথে প্রবেশ করিয়া তিনি বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, তাহা তাঁহার বাঙ্গালা নাটক, প্রহসন ও কাব্যাদি রচনা।

সেই সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল বেলগাছিয়াতে একটা স্থায়ী নাট্যশালা ছিল। প্রসিদ্ধ নাটক-কার 'কুলীন-

কুলসর্ব্বস্ব’ নাটক-প্রণেতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত রত্নাবলী নামক একখানা নাটক বহুদিন ধরিয়া এই বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। এ সময়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাট্যামোদিগণ এই রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করাইতে মনস্থ করিলে, মধুসূদনের বন্ধু বেলগাছিয়া নাট্যশালার অন্যতম সভ্য গৌরদাস বসাক মহাশয় মধুসূদনকে দিয়া রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনুসারে মধুসূদন রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ করেন। রচনা খুবই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং ওরূপ চমৎকার অনুবাদ করার জন্য মধুসূদন পাঁচ শত টাকা পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ হইতেই মধুসূদনের যশঃসূর্য্য উদিত হইতে লাগিল। এই অনুবাদ পাঠ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাকে একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এসময়ে বাঙ্গলা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক বড় বেশী ছিল না। আবার প্রাচীন নিয়মানুসারে লিখিত নাটক নব্যশিক্ষিতদের বড় মনঃপূতও হইত না। একদিন কথায় কথায় মধুসূদন তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবুকে বলিলেন যে, তাঁহারা কেন এই সামান্য রত্নাবলীর জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন? গৌরদাসবাবু উত্তরে বলিয়াছিলেন, দেশে নাটকের খুবই অভাব এবং সুন্দর সময়োপযোগী নাটক

রচনা করিতে পারেন, এমন লোকও খুব বেশী নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এত গোঁড়া যে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চান না। কাজেই ভাল যা দুই একখানা নাটক পাওয়া যায়, তাহাই অতি সাদরে অভিনীত হইয়া থাকে। মধুসূদন ইহা শুনিয়া বন্ধুর নিকট বাঙ্গালা ভাষায় ভাল নাটক রচনা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহা শুনিয়া গৌরদাস বাবু ত হাসিয়াই আকুল! আর তিনি কেনই বা হাসিবেন না? যে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় ভাল করিয়া কথাটাও বলিতে পারেন না—বাঙ্গালা ভাষার উপর যাঁর বাল্যকাল হইতেই প্রবল অশ্রদ্ধা—তিনি লিখিবেন কি না—বাঙ্গালায় একখানা ভাল নাটক! কিন্তু মাস কয়েক পরেই যখন মধুসূদন তাঁহার বন্ধুর নিকট "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বন্ধু ত অবাক্!

যাহা হউক, নাটকখানা সকলেরই খুব মনঃপূত হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালার সভ্যগণ নিজেদের ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত করিয়া অভিনীত করিলেন। মধুসূদন পুরস্কারও পাইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকখানা প্রাচীনতার পক্ষপাতী পণ্ডিতগণের নিকট তীব্র সমালোচনা লাভ করিলেও, নব্যশিক্ষিতগণের অনুরাগভাজন হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিয়া

তিনি স্বীয় শক্তির পরিচয় পাইলেন এবং অতঃপর মাতৃভাষার সেবায়ই আত্মনিয়োগ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

ইহার পর মধুসূদন তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের অন্তঃপ্রবিষ্ট দুর্নীতি কদাচার ও ভণ্ডামির তীব্র সমালোচনা করিয়া "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। দুইখানি প্রহসনেই তৎকালীন অধঃপতিত সমাজের আচার ব্যবহারের খুব উৎকৃষ্ট সমালোচনা হইয়াছিল। উভয় প্রহসনই বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া বহুলোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক ও প্রহসন দুইখানি রচনা করিয়া মধুসূদন সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। কৃতবিদ্য সমাজও তাঁহাকে প্রতিভাশালী সুলেখক বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ মধুসূদন এই সময়ে মাতৃভাষায় এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন যে, তিনি অনায়াসে তখন বাঙ্গালা ভাষায় যে কোন প্রকার আলোচনা করিতে পারিতেন;—আর নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণে তিনি অতিশয় নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

এইভাবে উৎসাহিত হইয়া মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটক প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক কেবল

গদ্যে লিখিত হইয়াছিল—কিন্তু তিনি 'পদ্মাবতী' নাটকে গদ্য এবং পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন ;—আর যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন, এই পদ্মাবতী নাটকখানাতেই সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিবার তাঁহার প্রথম উদ্যম। নাটক লিখিতে লিখিতে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে, যতদিন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা নাটকের বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই। আর বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, তিনি বাঙ্গালা পদ্য সাহিত্যে নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া দীনা বঙ্গভাষাকে নূতন ভূষণে মণ্ডিত করিবেন ; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও পণ্ডিত সমাজের কুৎসা ও নিন্দার ভয়ে এতদিন অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে সাহসী হন নাই। এখন 'পদ্মাবতী' নাটকে তাঁহার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই নাটকে তিনি যেন ভয়ে ভয়েই অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিয়াছিলেন, কেননা 'পদ্মাবতী' নাটকের অতি অল্প স্থলেই এই ছন্দ দেখা যায়। 'পদ্মাবতী' নাটকের ভাষাও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক হইতে অনেক সরল এবং সুন্দর।

এই সময়ে মধুসূদন মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের

উৎসাহ পাইয়া নূতন উদ্যমে আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" রচনা করেন এবং মহারাজের নামেই উহা উৎসর্গ করেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' বঙ্গ-সাহিত্যে এক তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিল। সেই সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই নূতন ছন্দে লিখিত এই কাব্যখানা উপহাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। নব্যতার বিরোধী পণ্ডিতেরা চারিদিকে বিদ্রূপের ঢেউ উঠাইয়া দিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকারকেরা এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের অনুসরণকারী লেখকেরা সকলেই এক-বাক্যে মধুসূদনের এই নূতন চেষ্টার নিন্দা করিতে লাগিলেন। যিনি মধুসূদনের গুণাবলী ও কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেন—মধুর দুরবস্থা দূর করিবার জন্য যিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—সেই গুণের সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তিলোত্তমার প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তবে কৃতবিদ্য সমাজের অনেক গণ্যমান্য লোক ইহার সুখ্যাতিও যে না করিয়া-ছিলেন, এমন নহে। যাহা হউক, অজস্র বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইলেও, মধুসূদন তাঁহার সংকল্পে অটল ও সাহসী ছিলেন। তিনি যদি এইরূপ উপহাসে ও উপেক্ষায় ভীত বা নিরুৎসাহ হইতেন, তবে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' লিখিয়া কাব্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন

না। মধুসূদনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা কাব্যের পুষ্টি সাধন করিবেই করিবে, এবং একদিন না একদিন ইহা শিক্ষিত সমাজে বহুল পরিমাণে আদৃত ও অনুসৃত হইবেই হইবে।

কিন্তু তিলোত্তমার ভাষা বড়ই কঠিন—এত কঠিন যে, ভাষার মর্ম্মভেদ করিয়া কাব্যের রসগ্রহণ করা অতিশয় কষ্টসাপেক্ষ। ভাষার এই কাঠিন্যের জন্য এবং ছন্দের সম্পূর্ণ নূতনত্বের জন্যই ইহা ওরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়াছিল। নিম্নে তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথম কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—ভাষার কাঠিন্য ইহাদ্বারাই বুঝা যাইবে,—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকুলধ্যেয় যোগী।"

যাহা হউক, মানুষের নিন্দায় বা ভ্রূকুটীতে গ্রাহ্য করিবার পাত্র মধুসূদন ছিলেন না। তিলোত্তমা রচনা করিয়া পণ্ডিত-সমাজে উপেক্ষিত এবং সাহিত্যিক সমাজে নিন্দিত হইলেও মধুসূদন কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। "তিলোত্তমা-সম্ভব"

যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরি উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি তাঁহার অমর কাব্য "মেঘনাদ বধ" রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "মেঘনাদ বধ" প্রকাশিত হইল। এই কাব্যেই মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। "মেঘনাদ বধ" প্রকাশিত হইলে "তিলোত্তমার" বিরুদ্ধ সমালোচক এবং বিদ্রূপকারিগণ বিদ্রূপবাণে আর উপেক্ষার হাসিতে মধুকে কাব্য-জগৎ হইতে তাঁহার অদ্ভুত ছন্দ লইয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। "মেঘনাদ বধে" ভাবের উচ্চতা ও গভীরতা, বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য্য এবং নানা রসের ও নানা অলঙ্কারের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া সমালোচকগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কাব্য পাঠ করিয়া শতমুখে মাইকেলকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মেঘনাদের ভাষা তিলোত্তমা হইতে অনেক সরল,—লালিত্য এবং বৈচিত্র্যে পূর্ণ। কোন কোন নিন্দক নানাভাবে মেঘনাদের নিন্দা করিলেও, মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য রচনা করিয়া তাঁহার অতুল প্রতিভার উপযোগী সম্মানও পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যতদিন বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, মেঘনাদ বধের সহিত ইহার অমর কবির নামও ততদিন স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

মেঘনাদ বধের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য প্রণয়ন করেন। আদর্শ এক হইলেও বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনায়' বৈষ্ণব কবিদের সেই প্রাণস্পর্শী ভাব অথবা তেমন মধুর নিপুণ চিত্র পাওয়া যায় না সত্য, তবুও তিনি আজন্ম সাহেবী চালে থাকিয়াও যে তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের ভাবের কথঞ্চিৎ সমাবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কৃষ্ণকুমারী একখানা করুণ রসের নাটক। রাজস্থানের ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে ইহা লিখিত। ইহাতে তিনি অতি নিপুণতার সহিত চরিত্রগুলি চিত্রিত করিলেও, তাঁহার কাব্যসমূহের ন্যায় তিনি নাটক লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। সময়ের স্রোতে এবং কাল ও রুচির পরিবর্ত্তনে তাঁহার নাটকগুলি এখন কতকটা উপেক্ষিত হইলেও, তিনি যে একজন নিপুণ নাট্যকার ছিলেন, এবং তাঁহার নাটকসমূহ যে বঙ্গভাষার উপকার সাধন করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার পর মধুসূদন "বীরাঙ্গনা কাব্য" রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ রোমান কবি ওভিডের একখানা কাব্যের অনুকরণে

মধুসূদন এই কাব্যখানা লিখিয়াছিলেন। মূলতঃ ওভিডের অনুকরণ হইলেও, ইহার ভাব সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অতি নৈপুণ্যের সহিত ইহা রচিত। এই কাব্যখানি তিনি তদীয় অশেষ উপকারক দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।)

(৬)

মধুসূদন পূর্ব্ববৎ কলিকাতা পুলিশ কোর্টে অনুবাদকের কাজই করিতেছিলেন। পুস্তক বিক্রয়ের আয়, চাকুরীর আয়, এবং পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে যে অর্থাগম হইত, তাহাদ্বারাই তাঁহার দিন এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। বস্তুতঃ এই সময়ে পারিবারিক জীবনে মধুসূদনের কোন অভাব না থাকিলেও, তাঁহার মনে সুখ বা শান্তি ছিল না। আত্মসংযম ব্যতীত মনের শান্তি সুখ পাওয়া খুবই দুর্লভ; মধুসূদনের চরিত্রে আত্মসংযমের খুবই অভাব ছিল; তদুপরি তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, আয়াতীত ব্যয়, আর ভোগ বিলাসের কামনা সময়ে সময়ে অত্যন্ত উদ্বেগ ও অশান্তি আনয়ন করিত। যে সকল কারণে মধুসূদনের মনে সুখ ছিল না, অপরিমিত ব্যয় এবং তন্নিবন্ধন অর্থাভাবই তাহার মধ্যে

প্রধান। দেশে আসিয়া তিনি অনেক কষ্টে নিজের পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ভাবিয়া বুঝিয়া চলিলে এ সময়ে তাঁহাকে অর্থক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু হাতে অর্থ আসিলেই মধু জলের মত ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার চিন্তা একটুও করিতেন না ; ফলে এই দাঁড়াইত যে, অর্থের অনটনে মধ্যে মধ্যে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেন। এইরূপে তাঁহার ঋণের বোঝাও বেশ্ ভারী হইয়া পড়ে।

অর্থের অনটন যখন কিছুতেই কমিল না, তখন মধু অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। মনে করিলেন, বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে, দেশে আসিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। ব্যারিষ্টারিতে প্রচুর অর্থাগম হইবে, এই কল্পনাই তাঁহাকে বিলাত গমনে প্রলুব্ধ করিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই তাঁহার বিলাত গমনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এক্ষণে অর্থ-ক্লেশে পড়িয়া স্বকীয় আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য তিনি ইংলণ্ডে যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তারপর পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে ইংলণ্ড প্রবাসের মাসিক খরচ চালাইবার সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া, ১৮৬২

খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। দুর্ভাগ্যও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল।

মধুসূদন ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ব্যারিষ্টারী শিখিবার মানসে সকল উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। কিন্তু প্রকৃত অনু-রাগের অভাবে তিনি কোনওরূপে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র।

মধুসূদন স্বদেশ ত্যাগ করিলে যাহাদের উপর নিজের বৈষয়িক ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, কথা ছিল, তাহারা মধুসূদনের পত্নীকে মাসিক দেড়শত টাকা দিবেন। কিন্তু কয়েক মাস পর্য্যন্ত রীতিমত দেড়শত টাকা করিয়া দিয়া তাহারা উহা বন্ধ করিয়া দিল। মধুসূদনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার স্ত্রী অর্থসাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অকূল সমুদ্রে পড়িলেন। তিনি আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া শিশু পুত্র কন্যা দুইটীকে লইয়া স্বামীর নিকট যাইতেই মনস্থ করিলেন। মধুসূদন তখন ভাষা শিক্ষার জন্য ফরাসী দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। পত্নী পুত্রকন্যা লইয়া সহসা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিপদ্ গণিলেন। একে তো তিনি অপরিমিতব্যয়ী—তদুপরি বিলাসিতার কেন্দ্রভূমি ফরাসী দেশে বাস—এর মধ্যে আবার পুত্রকন্যা সহ পত্নীর আগমন। মধুসূদনের সঞ্চিত অর্থ দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ

হইয়া গেল। তিনি ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন—শেষে বিদেশে ঋণও কেহ দেয় না। এইরূপে ঋণজালে জড়িত—দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়া মধুসূদন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, তাঁহার অন্ন সংস্থান করাও দায় হইয়া উঠিল। এই বিষম সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের করুণার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি আর অন্য উপায় না পাইয়া নিজের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা সবিস্তারে বর্ণন করিয়া তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য চাহিলেন। স্বদেশীয় প্রতিভাবান্ কবি বিদেশে যাইয়া অন্নাভাবে মারা যান শুনিয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে মধুসূদনের প্রার্থিত অর্থ ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার অবতার বিদ্যাসাগরের দয়ায় মধুসূদন সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। নচেৎ দেশে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া অর্থ লাভ ত দূরের কথা—মধুসূদনকে বিদেশে হয় অন্নাভাবে মরিতে হইত, অথবা ঋণের জন্য জেলে পচিতে হইত। তাই তিনি অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।"

ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়নে কতকটা ব্যস্ত থাকার জন্য মধুসূদন কবিতা লিখিবার বড় অবকাশ পাইয়া উঠিতেন না। তবুও কবিতা লেখা হইতে যে একেবারে বিরত থাকিতেন, এমনও নহে। কিন্তু বিলাত যাওয়া অবধি তাঁহার মনে জন্মভূমি ত্যাগ হেতু এবং অর্থ-ক্লেশের জন্য একটুকুও শান্তি ছিল না; কাজেই তখন তিনি যে কবিতা রচনা আরম্ভ করিতেন, তাহা আর শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এসময়ে তিনি যাহা লিখিতে আরম্ভ করিতেন, তাহা অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াই, আবার বিরক্তি বশতঃ বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার প্রবাসে আরব্ধ কাব্যসমূহের মধ্যে কেবল "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। (এই "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" ফ্রান্সের ভারসেলিস্ নগরে অবস্থান কালে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন। নানা বিষয়ের বিভিন্ন ছোট ছোট কবিতায় এই গ্রন্থখানি পূর্ণ। বলিতে গেলে ইহাই তাঁহার শেষ কাব্য। ইহার পরেও তিনি "হেক্টর বধ" "মায়াকানন', প্রভৃতি দুই একখানি সমাপ্ত ও অর্দ্ধসমাপ্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। "মায়াকাননে" মধুসূদনের জীবনের পূর্ণ নৈরাশ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। "মায়াকানন', ও 'হেক্টর বধ' তাঁহার শেষ জীবনে রচিত। বাস্তবিক

পক্ষে, "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বঙ্গ-ভাষার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।)

আর এক কথা,—মধুসূদনের চিরপ্রিয় বঙ্গভূমির প্রতি কিরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল—জন্মভূমির কেমন মুখোজ্জ্বল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি কেমন যত্নপর ছিলেন,—কোন একটা বিশেষ কাজ করিয়া কিরূপে মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কতদূর যত্ন ছিল—তাহা তাঁহার অনেক কবিতায় স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। বঙ্গভূমির উদ্দেশ্যে লিখিত "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে", 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' সূচনায় "রচ চধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি", 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর' 'সমাপ্তে' "জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে"—ইত্যাদি অসংখ্য কবিতায় কবি-হৃদয়ের উচ্চ বাসনা স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত। বস্তুতঃ তিনি যেদিন হইতে মাতৃভাষার সেবা আরম্ভ করেন, সেদিন হইতেই ইহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কামনা এবং তজ্জন্য যথাশক্তি যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের আর একটী গুণ ছিল, "তিনি কবিগণের বা গুণিগণের অবমাননা করিতেন না। অসাধারণ উন্নতমনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় আপনার

অলোকসামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপন চতুর্দ্দশপদী কবিতায় গুণিদিগকে অন্তরের সহিত স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন। পুরুষের হৃদয় তো এইরূপই হওয়া উচিত বটে; চারিদিকে যশঃসৌরভ নিঃসারিত হইতেছে, অথচ অভিমান নাই; কেবল গোলাপ ফুলের মত আপনার মনে আপনি হাসিতেছে।" *

পাঁচ বৎসর কাল প্রবাসে বাস করিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড প্রবাস কালে বঙ্গীয় নরনারী "মেঘনাদ বধ" পড়িয়া তাঁহার উচ্চপ্রতিভা এবং অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অর্থাকাঙ্ক্ষায় সাহিত্য-সেবা ছাড়িয়া ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করিলে, প্রথম প্রথম তাঁহার যথেষ্ট অর্থলাভ হইতে থাকিলেও, শেষে কিন্তু তিনি আর ব্যবসায় চালাইতে পারিলেন না। মধুসূদনের ন্যায় সরলপ্রাণ ভাবুক কবির পক্ষে ব্যারিষ্টারির কূটজাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনি এই ব্যবসায়ে উন্নতি মাত্রই করিতে পারিলেন না।

* মাইকেলের মৃত্যুতে "সমাজ-দর্পণ" নামক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এসময়ে কেবল আর্থিক উন্নতির দিকেই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় ঋণ করিয়াও নিজের বর্ত্তমান চাল সম্পূর্ণ বজায় রাখিতেন,—এদিকে টাকা পয়সা তাঁর হাতে আসিলেই উড়িয়া যাইত—লাভের মধ্যে চাল এবং ঋণগুলিই থাকিয়া যাইত। অর্থাভাবে নানারূপ দৈন্য দশায় পড়িয়াও কিন্তু তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। তিনি প্রায়শঃই সামান্য কারণে বা অকারণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কেহ সাহায্য চাহিলে তিনি গণিয়া টাকা কোন দিনই দেন নাই। কিন্তু ব্যয়ের অনুরূপ আয় না থাকাতে তিনি কেবল ঋণ-জালেই জড়িত হইতেছিলেন। শেষ বয়সে এমন দাঁড়াইল যে তিনি মনের অশান্তি এবং ঋণের ভারে প্রপীড়িত হইয়া ভয়ানক মাত্রায় সুরাপান করিয়া করিয়া নিজের মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আনিতে লাগিলেন। এরূপ অত্যাচার ও শারীরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন আর বেশী দিন সহ্য হইল না। শীঘ্রই ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল,—মধুসূদন নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

(৭)

শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, অর্থ চিন্তা এবং সাংসারিক নানা দুঃখে মধুসূদন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। ব্যারিষ্টারিতে আর কোন উন্নতির আশা নাই দেখিয়া, তিনি এই সময়ে মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া, সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। ইহার পরে তিনি কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকার জনসাধারণ বঙ্গের এই প্রতিভাশালী কবিকে স্থানীয় পোগোজ স্কুলের বিস্তৃত ময়দানে অভিনন্দিত করেন। মধুসূদন তখন রোগে জীর্ণ—ঋণভারে নিপীড়িত। তাঁহার তখন এমন দুরবস্থা যে, তাঁহার মত অভিমানী আত্ম-সম্মান রক্ষণে সতত যত্নশীল ব্যক্তিও ঢাকা নগরীর লোকের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই অর্থে আর কয় দিন চলে ?

ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধুসূদনের রোগ আরও কঠিনাকার ধারণ করিল। মধুসূদনের পত্নীরও সাংসারিক অশান্তিতে স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তমর্ণ-গণ পূর্ব্বের ন্যায় আর ঋণও দিত না। কাজেই পতি পত্নীর

চিকিৎসার ব্যয় এবং অপোগণ্ড শিশু দুইটীর ভরণপোষণ একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল ; শিশুদিগের আহারের কোনপ্রকার সংস্থান করিয়া স্বামী স্ত্রীতে অনেক সময় অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়েই তিনি 'হেক্টর বধ' প্রণয়ণ করেন এবং তদ্দরুণ যে সামান্য কিছু অর্থলাভ হইয়াছিল, তাহা এই অসময়ে মধুসূদনের বড় উপকারে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদ্বারা তাঁহার অর্থ-ক্লেশ স্থায়ী ভাবে দূর হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

মধুসূদন চিরদিনই অভিমানী ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে বিষম বিপদে পড়িয়া তিনি বন্ধুবান্ধবের নিকটও সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বন্ধুদের মধ্যে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ তাঁহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার রোগের চিন্তা হইতে ঋণের চিন্তা বেশী হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়া ঋণের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইতে অভিলাষী হইলে, উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে স্বীয় আবাসে স্থান দিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রায় মৃত্যুশয্যায়ই শায়িত ছিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা চিন্তা করিলেও দুঃখ হয়।

মৃত্যুর সাত আট দিন পূর্ব্বে মধুসূদন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তিনি তখন উত্থান-শক্তি রহিত—তাঁহার চিকিৎসা চলা কঠিন। তাঁহার পত্নীও তখন মুমূর্ষু। অবশ্যই ইতিপূর্ব্বে তিনি বন্ধুগণের অর্থসাহায্যে স্বীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপে ভয়ানক বিপন্ন হইয়া পত্নীকে কন্যার আশ্রয়ে রাখিয়া, বন্ধুগণের পরামর্শে নেহাৎ সাধারণ লোকের মত বঙ্গের কবিকুল-কহিনুর মধুসূদন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় লইলেন।

মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা হতভাগিনী পত্নী হেন্‌রিয়েটা তাঁহাকে আরো বিপন্ন ও শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে প্রস্থান করেন। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কবি এই সংবাদে আরও কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বন্ধুবর্গের নিকট আত্মকৃত অপরাধ ও অপরিণামদর্শিতার জন্য গভীরভাবে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া, ভগবানের নিকট স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিয়া এবং ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের হস্তে পুত্রকন্যা দুইটীর ভার অর্পণ করিয়া, বাঙ্গালা কবিতার যুগান্তকারী মহাকবি, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি রবিবার দিবসে, বেলা দুইটার সময়, আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহ-ত্যাগ করেন। মধুসূদন শেষ সময়ে মুক্ত-কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তি

যেন তাঁহার মত অপরিণামদর্শিতা দেখাইয়া স্বহস্তে জীবনে বিষবৃক্ষ রোপণ না করে, তদ্বিষয়ে জগৎকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন।

অশান্তিতে জীবন যাপন করিলেও মধুসূদনের জন্ম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতৃভাষাকে এক নূতন শ্রীতে বিভূষিত করিয়া বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার জীবনী আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দেয়। একদিকে যেমন তিনি সরল, অমায়িক, বিদ্যোৎসাহী, প্রকৃত কর্ম্মী, সংকল্প সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সৎসাহসী ছিলেন, অন্য দিকে তিনি তেমনি ভোগী, বিলাসী, অপরিণামদর্শী, উচ্ছৃঙ্খল এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন। যে সকল দোষ মধুসূদনে ছিল, তন্মধ্যে অপরিমিতব্যয়িতাটাই ছিল প্রধান—হিসাব করিয়া চলিলে তিনি কখনও এত বিপদে পড়িতেন না। তিনি বলিতেন, বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা না হইলে একজন ভদ্রলোকের চলিতেই পারে না। ঠিক চালে চলিবার জন্য তিনি ঋণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। অবশেষে ঋণ-জালে এরূপ জড়িত হইয়া পড়েন যে, উত্তমর্ণগণের উৎপাতে তিনি সময়ে সময়ে আত্মহত্যাও করিতে চাহিতেন। তারপর মানসিক অশান্তি দূর করিবার জন্য এত অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন যে, তাহাতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি কমিয়া যায়,

এবং পরে ভিখারীর মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে এই মহাকবিকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। দোষ গুণ মধুসূদনের চরিত্রে সমভাবেই ছিল। কিন্তু তিনি যে অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী কবি এবং বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই।

চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। কিন্তু তার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় জগৎ মোহিত হয়। মধুসূদনের শত দোষ থাকিলেও তাঁর প্রতিভায় বঙ্গভাষা উদ্ভাসিত। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন,—"যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

"স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লূকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?"

বাস্তবিক যতদিন বঙ্গ ভাষার গৌরব থাকিবে—যতদিন

বাঙ্গালী প্রতিভা ও কবিত্বের আদর করিবে, ততদিন তাহারা কবিবর হেমচন্দ্রের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবে—

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।"

শেষ